SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বর্ণপ্রথা

Subrata Khanra
Assistant Professor
Dept. of Sanskrit
A. K. P. C Mahavidyalaya
Bengai, West Bengal, India
Email: subratakhanra89@gmail.com

Abstract: প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিত্তি গঠনে বর্ণব্যবস্থা তথা বর্ণপ্রথা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আর সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য সেই বর্ণব্যবস্থা বা শ্রেণিবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার একটি সমৃদ্ধ চিত্র প্রদান করে থাকে। সমাজ যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চার বর্ণে বিভক্ত হয়েছিল, তা কিন্তু কেবল জন্মের ভিত্তিতে নয়। এরূপ বিভাজনের মূলে যে ছিল গুণ (গুণ) ও কর্ম (কর্তব্য) তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাই সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষতঃ নাট্য সাহিত্যে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত নাট্যকার কালিদাস, ভাস, শূদ্রক প্রমুখের রচনায় পূর্বোক্ত বর্ণ চতুষ্ঠয়ের কার্যকর ভূমিকা, বিশেষাধিকার ও সীমাবদ্ধতা জীবন্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। চতুর্বর্ণের বিভাজন যে কর্তব্য কর্মের নিরিখে ছিল তার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কথা। ব্রাহ্মণরা ছিলেন জ্ঞান, আচার ও আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের ধারক; অন্যদিকে ক্ষত্রিয়রা রাজা, যোদ্ধা ও সামাজিক শৃঙ্খলার রক্ষক; বৈশ্যরা বাণিজ্য, কৃষি ও অর্থনৈতিক কল্যাণে নিয়োজিত; আর শূদ্ররা সেবাদাতা শ্রেণি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং প্রায়শই তাদের প্রান্তিক এবং বৈদিক জ্ঞানে প্রবেশাধিকারের বাইরে রাখা হয়েছে। এই পত্রে মূল যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হবে সেটি হল সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য কেবল তার সময়ের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধকেই উপস্থাপন করে না, বরং ভারতীয় সংস্কৃতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বর্ণব্যবস্থার টানাপোড়েন, অভিযোজন এবং ক্রমবিকাশমান ব্যাখ্যাকেও প্রতিফলিত করে।

Keywords: বর্ণব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

ভারতীয় সভ্যতার সাথে সাথেই বর্ণপ্রথার বিকাশ শুরু হয়। এই প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক বর্ণের নিজ নিজ বিশেষ কিছু কর্তব্য আছে এবং তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ণপ্রথা সামাজিক কার্যাবলী বন্টনের জন্য গঠন করা হয়েছিল। একটি পরিবারে যেমন পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টন করা হয়, তেমনি বর্ণপ্রথার মাধ্যমে একটি সমাজের বিভিন্ন কার্যাবলী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। এটি একটি সাংগঠনিক ব্যবস্থায় কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগের অনুরূপ। এই বর্ণপ্রথার উদ্দেশ্যই হল মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। সকল বর্ণের মানুষই সমান, কিন্তু ওদের মধ্যে পার্থক্য হল গুণ এবং কর্মের। উপনিষদ্ এবং মনুস্মৃতিতে উল্লিখিত বর্ণপ্রথার আধারই হল ব্যক্তির গুণ এবং কর্মে। সাংখ্য দর্শনে সত্ত্ব, রজঃ ও তম —নামক তিনটি গুণের স্বীকার করা হয়েছে। এই ত্রিবিধ গুণের বিক্ষোভের ফলে প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির অন্যসব কিছুর মত মানুষও এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে গঠিত। তবে মানুষের মধ্যে এই তিনটি গুণ সমভাবে থাকে না। কেউ সত্ত্ব গুণ প্রধান, আবার কোন

মানুষের মধ্যে রজঃ গুণের প্রাধান্য, আবার কারো মধ্যে তমঃ গুণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। গুণের এই প্রাধান্য অনুসারে ব্যক্তির বর্ণ ও কর্ম পৃথক পৃথক হয়। সত্ত্ব গুণ হল স্বচ্ছ ও বুদ্ধি প্রধান। মানুষের মধ্যে চিন্তার স্বচ্ছতাহেতু সত্ত্বগুণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। চিন্তার স্বচ্ছতার কারণেই ব্রাহ্মণদের পূজাপাঠ, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানের অধিকার সুনির্দিষ্ট করা হয়। রজঃ গুণ চঞ্চল, শৌর্য, বীর্য ও বীরত্বের প্রতীক। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে রজঃ গুণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রজাপালন ও সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ভার ভারতীয় শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়দের ওপর ন্যস্ত করেছে। তম গুণ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অলস। ভারতীয় শাস্ত্র অনুসারে শূদ্রদের মধ্যে তমঃ গুণের আধিক্য থাকায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদিদের সেবা করার কাজ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এইভাবে দেখলে ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন গুণ ও কর্মের সমাবেশের দ্বারা সমাজদেহ গঠন করেছেন। ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় জন্মসূত্রকে গুরুত্ব না দিয়ে গুণ ও কর্মের দ্বারা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। যা একদিকে যেমন কর্ম অনুযায়ী সামাজিক জীবিকাকে সুনির্দিষ্ট করে, তেমনি সেই কর্ম গুণ অনুসারী হওয়ায় কর্মের দক্ষতাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পত্রে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বর্ণপ্রথার বিষয়টি বিস্তৃতভাবে দেখানো হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন যে, চারটি বর্ণ— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এর সৃষ্টি আমি গুণ এবং কর্মের ভিত্তিতে করেছি।[১] বেদের পুরুষসূতে বিরাট রূপের বর্ণনায় ব্রাহ্মণকে বিরাটরূপ ভগবানের মুখ, ক্ষত্রিয়কে হাত, বৈশ্যকে উরু বা মধ্যভাগ এবং শূদ্রকে পদ বা চরণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[২] শরীরে যেমন মুখ, হাত, ঊরু এবং পায়ের নিজ নিজ কর্তব্য এবং মহত্ত্ব আছে, তেমনই সমাজেও চার বর্ণের আবশ্যকতা এবং মহত্ত্ব আছে। ব্রাহ্মণকে মুখ বলার তাৎপর্য হল যে তাঁর কাছে জ্ঞানের পুঁজি আছে এবং সেই কারণে চার বর্ণ বা জাতিকেই পড়ানো, ভালো শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ শোনানো—এ সব মুখের কাজ। এই দৃষ্টিতেই ব্রাহ্মণকে উচ্চ বা শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়েছে। বাহুদ্বয় শক্তির দ্যোতক, ক্ষত্রিয়কে হাত বলার অর্থ হল যে তারা চার বর্ণকেই শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। রক্ষা করা মুখ্যতঃ হাতেরই কাজ। যেমন শরীরে যদি ফোড়া ফুসকুড়ি ইত্যাদি হয় তাহলে হাত দিয়েই তাকে রক্ষা করা বা বাঁচানো হয়। তেমনি শরীরে চোট বা আঘাত এসে পড়লে বা লাগলে তা থেকে বাঁচার জন্য হাতেরই আড়াল দেওয়া হয়, আবার নিজেকে রক্ষা করা বা বাঁচানোর জন্যও অন্যের উপর হাত দিয়েই আঘাত করা হয়ে থাকে। মানুষ কোথাও পড়ে গেলে তার হাতই উঠবার অবলম্বন বা আশ্রয়রূপে থেকে যায়। এই সব কারণে ক্ষত্রিয় হয়ে গেলেন হাত। তবে অরাজকতা চারদিকে ছড়িয়ে গেলে ধন-জন ইত্যাদি রক্ষা করা চার বর্ণেরই ধর্ম বা মুখ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। বৈশ্যকে মধ্যভাগ বলার তাৎপর্য হল যে, যেমন পেটে অন্ন, জল, ঔষধাদি ঢেলে দেওয়া হয়, তা থেকে দেহের সর্বাবয়বেরই খোরাক বা খাদ্য মিলে যায় এবং সব অঙ্গ বা অবয়বই তাতে পুষ্ট হয়, ঠিক তেমনিই জিনিসপত্র সংগ্রহ করা, তাদের নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া, যেখানে যে জিনিসের ঘাটতি সেখানে সেই জিনিস পৌঁছে দেওয়া, জনগণের কোন জিনিসের অভাব না হতে দেওয়া— এ সব হল বৈশ্যের কাজ। পেটে অন্ন- জলের সংগ্রহ সারা শরীরের জন্যই করা হয়ে থাকে এবং সেইসঙ্গে পেটেরও পুষ্টি লাভ হয়। কারণ মানুষ কেবল পেটেরই জন্য পেটকে ভরায় না। ঠিক তেমনিই বৈশ্যও যেন অন্যের জন্যই সংগ্রহ বা অন্নাদি খাদ্যের জোগাড় করে, কেবল নিজের জন্য নয়। সে ব্রাহ্মণাদিকে দান করে, ক্ষত্রিয়দের অর্থাৎ রাজা বা সরকারকে ট্যাক্স্

দেয়, নিজের পালন করে এবং শূদ্রদের মজুরী, তাদের মেহনতের প্রতিদান দিয়ে থাকে। এইভাবে সে সকলের প্রতিপালন করে থাকে। সে যদি সংগ্রহ না করে, কৃষি, গোরক্ষা অর্থাৎ পশুপালন, বাণিজ্য না করে তো কী দেবে? কোথা থেকে দেবে? শূদ্রকে চরণ বলে বর্ণনা করার অভিপ্রায় হল এই যে, যেমন চরণ সারা শরীরকে উঠিয়ে নিয়ে ঘোরায় ফেরায় এবং সম্পূর্ণ শরীরের সেবা চরণের দ্বারাই হয়ে থাকে অর্থাৎ সব ভারই তারই উপর ন্যস্ত বা আরোপিত হয়, ঠিক তেমনিই সেবার আধার বা আশ্রয়ের উপরই চারটি বর্ণই চলে থাকে। শূদ্র আপন সেবা কর্মের দ্বারা সকলের আবশ্যক কার্য্যসমূহের পূর্তি বা পূরণ করে দেয়। এই চার বর্ণের কর্মগুলি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য অনুযায়ী আলোচিত হল।

আচার্য মনু ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্ম নির্ধারণ করেছেন– অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ।[৩] এতে বোঝা যায়, ব্রাহ্মণের প্রধান ভূমিকা ছিল জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান বিতরণ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন। মনুসংহিতা ও প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে ব্রাহ্মণ সর্বদা জ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিকতার ধারক হিসেবে চিত্রিত। মহাকবি ভাস ও কালিদাস নাটকগুলিতে ব্রাহ্মণ সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।আবার মধ্যমব্যায়োগ অনুসারে ব্রাহ্মণ কেবল চার বর্ণের মধ্যেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতে পূজনীয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলমে কণ্ব ঋষি ও অন্যান্য আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণরা রাজনীতির বাইরে থেকেও সমাজকে নৈতিক দিকনির্দেশ দেন।তাঁরা জ্ঞান, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক।[৪] প্রতিমানাটক অনুসারে ব্রাহ্মণ নিত্য দৈনিক হবন, যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করত। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস মূলত রাজনৈতিক নাটক হলেও, এখানে ব্রাহ্মণরা রাজদরবারে উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত। তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভাস, কালিদাস, বিশাখদত্তদের নাটকে তাঁরা সমাজের প্রথম স্থানে, রাজনীতির উপদেষ্টা ও আচার্যরূপে উপস্থিত। ভট্টনারায়ণের নাটকে ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ ও তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে পারদর্শী।তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য সমাজজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মৃচ্ছকটিক অনুসারে ব্রাহ্মনকে দক্ষিণা দান পবিত্র কর্ম ছিল, সামাজিক সমারোহ প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেওয়া পুণ্যকর্ম ছিল। আবার ব্রাহ্মণের পৈতাধারণ করা আবশ্যক ছিল, তা আমরা মৃচ্ছকটিক থেকে জানতে পারি। তবে মৃচ্ছকটিক-এ এসে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা কিছুটা হ্রাস পেলেও ধর্মীয় জীবনে তাঁদের ভূমিকা অপরিহার্য থেকেছে।

ভারতীয় সমাজে ক্ষত্রিয়রা ছিলেন শক্তি ও শাসনের প্রতীক। তাঁদের প্রধান কর্তব্য ছিল প্রজারক্ষা, ধর্মপালন, যুদ্ধ ও ন্যায়বিচার। মনুসংহিতা, ভগবদ্গীতা এবং বিভিন্ন সংস্কৃত নাটকে ক্ষত্রিয় ধর্মের বহুমাত্রিক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আচার্য মনুর মতে ক্ষত্রিয়ের চার প্রধান কর্ম হলো—প্রজাগণকে রক্ষা করা, দান করা, যজ্ঞ করা ও অধ্যয়ন করা।[৫] অতএব ক্ষত্রিয় কেবল যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ নন, ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনেরও ধারক। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ক্ষত্রিয়ের প্রাকৃতিক গুণ হলো—শারীরিক শক্তি ও বীর্য,তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তা,কর্মদক্ষতা,যুদ্ধ থেকে পলায়ন না করা,দানশীলতা। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের আদর্শ হলো যুদ্ধ ও ত্যাগ, শক্তি ও দয়া—এই দুইয়ের সমন্বয়। ভাসের প্রতিমানাটকে রাবণ সীতাকে অপহরণ করলে সীতা বলেন, যদি রাম ক্ষত্রিয় ধর্মে বিশ্বাসী হন তবে তাঁকে অবশ্যই রক্ষা করবেন।[৬] এখানে ক্ষত্রিয়ের পরিচয় দুর্বল ও নিরপরাধকে রক্ষা করা। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকে ক্ষত্রিয় রাজা দুষ্মন্ত শুধু যোদ্ধাই নন, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও প্রজার অভিভাবক।এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে প্রজাপালনই রাজার চরম ধর্ম।[৭] বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নামক রাজনৈতিক নাটকে চন্দ্রগুপ্ত একজন ক্ষত্রিয় হিসেবে

জনগণকে রক্ষা ও রাজ্যপালন করেন। এখানে ক্ষত্রিয়ের পরিচয় আসে রাজনীতি ও প্রশাসনে শক্তিশালী নেতৃত্ব হিসেবে।শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে রাজা পালক ও তাঁর সেনাদল সমাজরক্ষার প্রতীক। যদিও মূল কাহিনী বৈশ্য চরিত্রকে কেন্দ্র করে, তবু ক্ষত্রিয়দের কাজ রাজ্যরক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রদান। কিরাতার্জুনীয়ম মহাকাব্যে অর্জুন তপস্যা করে মহাদেবের আশীর্বাদ লাভ করেন। ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব, আত্মোৎসর্গ ও অনমনীয় যুদ্ধস্পৃহা এখানে স্পষ্ট।

ভারতীয় সমাজে বৈশ্যরা অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিলেন। কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, ঋণদান—এসব কাজের মাধ্যমে তাঁরা রাষ্ট্রের উন্নতি ও জনজীবনের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতেন। মনুস্মৃতি, মৃচ্ছকটিক ও অন্যান্য সংস্কৃত নাটকে বৈশ্য চরিত্র সমাজের অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। আচার্য মনুর মতে বৈশ্যের ধর্ম হলো—পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, সুদে টাকা ধার দেওয়া ও কৃষিকাজ।[৮] অর্থাৎ বৈশ্যরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করার প্রধান দায়িত্ব পালন করতেন। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে চারুদত্ত নামক বৈশ্য চরিত্রটি ধনী ব্যবসায়ী, যিনি নৈতিকতা ও দানশীলতার প্রতীক। এখানে বৈশ্যকে শুধু ব্যবসায়ী নয়, সমাজে সচ্চরিত্র, দাতা ও সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসে বৈশ্যদের "নৈগম", "শ্রেষ্ঠী", "সার্থবাহ" ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য, ধনসম্পদ ও রাষ্ট্রের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত।নাটকে দেখা যায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময় বৈশ্য সমাজ অর্থনৈতিক শক্তি দিয়ে সমর্থন জুগিয়েছে। ভাসের প্রতিমানাটকে বৈশ্যরা সামাজিক অনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করতেন, তাঁরা ধনসম্পদ দিয়ে সমাজ ও ধর্মীয় কার্যকে সমর্থন করতেন। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমের নগরচিত্রে বৈশ্যদের উল্লেখ আছে। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বজায় রাখতেন। রঘুবংশ মহাকাব্যে রঘুকুলের রাজারা প্রজার মধ্যে বৈশ্যদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন, কারণ রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি বৈশ্যদের উপর নির্ভরশীল।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শূদ্র বর্ণ ছিল চতুর্থ স্তর। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা অন্যান্য তিন বর্ণের তুলনায় অনেক নিম্ন ছিল। মনুস্মৃতি ও সংস্কৃত নাটকে শূদ্রদের স্থান প্রায় সর্বত্র ‘সেবক’, ‘অধস্তন’ ও ‘অস্পৃশ্যতার’ ধারণার সঙ্গে যুক্ত। তবে কিছু নাটকে তাঁদের সামাজিক অবস্থার বাস্তব চিত্রও ফুটে উঠেছে। মনুর মতে শূদ্রের একমাত্র কর্তব্য হলো—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করা।[৯] অর্থাৎ শূদ্রকে সমাজে অন্য তিন বর্ণের অধীনস্থ রাখা হয়েছে। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকে শকার চরিত্রকে প্রাকৃতভাষী হিসেবে দেখানো হয়েছে।প্রাকৃত ভাষা ছিল শূদ্র ও সাধারণ মানুষের ভাষা; তাঁদের সংস্কৃত ভাষা ও বেদ পাঠের অধিকার ছিল না। এই নাটকে শূদ্রদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদা ও অস্পৃশ্যতার চিত্র স্পষ্ট।কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকে রাজপরিসরে দাস-দাসীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই দাসীরা আসলে শূদ্র শ্রেণির প্রতীক।তাঁদের কাজ ছিল রাজা-রানী ও অভিজাতদের সেবা করা। মালবিকাগ্নিমিত্রমে রাজকীয় দাসী ও কর্মচারীরা শূদ্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত। শূদ্রদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল কেবল সেবায়।বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকেরাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শূদ্ররা সরাসরি ভূমিকা পাননি।তবে বিভিন্ন নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও গুপ্তচরের ভূমিকায় তাঁদের উপস্থিতি রয়েছে। প্রতিমানাটকে শূদ্রদের সামাজিক মর্যাদা নিম্ন হলেও, তাঁরা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রান্তিক সাক্ষী হিসেবে উঠে এসেছেন।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ছিল বর্ণপ্রথা। বর্ণ ব্যবস্থার নীতি সম্মিলিতভাবে মানুষকে দেহ থেকে আত্মায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি মানুষের চারটি প্রবৃত্তি। সুতরাং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার দ্বারা যে সামাজিক বিভাজন তা মানুষের নিজের স্বার্থে কৃত্রিম বিভাজন, যেখানে ধর্মীয় গোঁড়ামি স্থান পায় নি। ধর্মীয় গোঁড়ামি না থাকার কারণে প্রাচীন হিন্দু সমাজের বর্ণ ব্যবস্থা কখনই নিশ্চল ছিল না। ব্রাহ্মণ যেমন ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হয়েছে, তেমনি ক্ষত্রিয়ও উন্নীত হয়েছে ব্রাহ্মণত্বে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বামিত্র একজন ক্ষত্রিয় ছিলেন কিন্তু তার গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রে সকল বর্ণকেই মানববর্ণ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমগুণ থাকলেও সব মানুষের মধ্যে এই সবকটি গুণ সমানভাবে ছিল না। গুণের পার্থক্য হেতু ব্যক্তির কর্ম করার সামর্থ্য একই মাত্রায় থাকে না। সুতরাং গুণ অনুযায়ী কর্মের বিভাজন অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। ভদগীতায় বলা হয়েছে: যম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণদের স্বভাবগত ধর্ম। শৌর্য, তেজ, দাক্ষ্য, যুদ্ধে অপারংমুখতা, দানে মুক্তহস্ত, ঈশ্বরভাব হল ক্ষত্রিয়ের স্বভাবগত ধর্ম। আর পরিচর্যা বা সেবা হল শুদ্রের স্বভাবগত ধর্ম। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের অবস্থার জন্য দায়ী হলেও ব্যক্তি তার জন্য নির্দিষ্ট কর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম পালনের মাধ্যমে সমাজে উচ্চতর স্থান লাভে সমর্থ হতে পারে। প্রত্যেককেই তার স্বধর্ম পালন করা বিধেয় বলে শাস্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে।[১০]

Endnotes

১. "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম বিভাগশঃ"- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
২. ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত্ ॥ পুরুষসূক্ত
৩. অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঃ চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ। মনুসংহিতা ১ /৮৮
৪. দ্বিজোত্তমা পূজ্যতমাঃ পৃথিব্যাম্ " – মধ্যমব্যায়োগ
৫. প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ মনুস্মৃতি ১/৮৯
৬. ক্ষাত্রধর্মে যদি স্নিগ্ধঃ কুর্যাৎ রামঃ পরাক্রমম্ । প্রতিমানাটকম্ ৫/২১
৭. স্বসুখনিরাভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহিতোঃ ।
প্রতিদিনমথবা তে বত্তিরেবং বিধৈব ॥ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ৫/৭
৮. পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ ।
বণিক্পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥ মনুস্মৃতি ১/৯০
৯. একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূযযা ॥ মনুস্মৃতি ১/৯১
১০. শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কর্মযোগ ৩৫

Bibliography

- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার। (১৯৫৯)। ভারতীয় সাহিত্য। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।
- সেন, সুকুমার। (১৯৬০)। সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- বসু, অমলেন্দু। (১৯৭২)। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্য। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। (১৯৬৫)। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য। কলকাতা: মিত্র অ্যান্ড ঘোষ।
- শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯১৭)। ভারতীয় নাটক। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
- চক্রবর্তী, নারায়ণ। (১৯৮৫)। সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা। কলকাতা: প্রগতি প্রকাশনী।

- চক্রবর্তী, অজিতকুমার। (১৯৭৪)। কালিদাস ও সংস্কৃত নাটক। কলকাতা: গ্রন্থমেলা।
- ভাস। (অনুবাদ: দীনেশচন্দ্র সেন)। (১৯২৮)। প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্নবাসবদত্ত, প্রতিমা নাটক। কলকাতা: ভারতী।
- কালিদাস। (অনুবাদ: নীহাররঞ্জন রায়)। (১৯৩২)। অভিজ্ঞান শকুন্তলম, বিক্রমোর্ভশীয়ম, মালবিকাগ্নিমিত্রম। কলকাতা: বাঙলা একাডেমি।
- শূদ্রক। (অনুবাদ: সুকুমার সেন)। (১৯৪৮)। মৃচ্ছকটিক (মাটির গাড়ি)। কলকাতা: মিত্র অ্যান্ড ঘোষ।
- ভবভূতি। (অনুবাদ: সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ)। (১৯৫০)। উত্তর রামচরিত, মালতীমাধব। কলকাতা: বিশ্বভারতী।
- মুখোপাধ্যায়, সত্যবতী। (১৯৮০)। সংস্কৃত নাটকে সমাজচিত্র। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। (১৯৪২)। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস। কলকাতা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ।

——